সংবাদ

তারিখ ... 05 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ .....

বিশ্ব শিক্ষক দিবসে শিক্ষকের কথা

শ্যামল কুমার সরকার

আজ ৫ অক্টোবর। বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পেশাজীবী সংগঠনের আন্তর্জাতিক দিবস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, ইউনেস্কো ও আইএলওর সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সদিচ্ছায় ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর অর্জিত হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষক সনদ। ১৪৬ ধারা-উপধারা বিশিষ্ট এই সনদে শিক্ষাকে জাতি গঠন ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই সনদে শিক্ষকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সব দেশের প্রায় দুই কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষকের ২১০টি জাতীয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা "এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল" এর বিরতিহীন অনুরোধের প্রেক্ষাপটে ইউনেস্কোর ২৬ তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইউনেস্কোর সে সময়কার মহাপরিচালক ড. ফ্রেডারিক মেয়রের বৈপ্লবিক ঘোষণার ফলে প্রতি বছর ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উদযাপিত হয়। সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে এবং এশিয়ার উন্নত দেশসমূহে "বিশ্ব শিক্ষক দিবস" আড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এ দিবস পালনে সরকারি কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। অথচ খোদ সরকারের পক্ষ থেকেই বলা হয় শিক্ষকরা মহান-শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। সরকারের এই দ্বৈত ভূমিকা রহস্যজনক। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারখানায় কাজ করেন। সে কারখানার সব উৎপাদিত পণ্য সব সময় মানসম্পন্ন হয় না। এটা বেদনাদায়ক। এজন্য শিক্ষকদের অবশ্যই দায় আছে। তবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালাও উল্লেখিত বিষয়ে কম দায়ী নয়।

স্বাধীনতার পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে একই সাথে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করে প্রাথমিক শিক্ষাকে গণমুখী ও নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে কোন রকম নীতিমালা ছাড়া বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের এ ধারা এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে ২৮৫টি কলেজ ও ১৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলমান আছে। অথচ এর কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। অবশ্য জেলা সদরসমূহের ১৮টি মহিলা কলেজ এবং তৎকালীন মহকুমা সদরসমূহের কলেজ ও স্কুল সরকারিকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। দেশের হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র কয়েক শত প্রতিষ্ঠান সরকারি (৬০০টি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি)। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায় পুরোপুরি সরকারের ওপর। অন্যদিকে রয়েছে এমপিওভুক্ত (২৭,৬৪৩টি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি) ও শতভাগ প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোচনীয়। স্বাধীনতালাভের এত বছর পরেও সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণের কোন কার্যকরি উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বৈষম্যহীন শিক্ষার কথা যুগের পর যুগ ধরে সংবিধানের পাতাতেই থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের আন্দোলন ও সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরেই নীরবে-নিভৃতে কাঁদছে। রাষ্ট্র যেন কিছুই শুনছে না। গত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনেক। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের বদ্ধ থাকা টাইমস্কেল ছাড়করণ ছাড়া গত সরকার এ ক্ষেত্রের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য আর্থিকভাবে আর তেমন কিছুই করেননি। অবশ্য এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া পাঁচ গুণ (১০০/- হতে ৫০০/-), চিকিৎসা ভাতা দ্বিগুণ (১৫০/ হতে ৩০০/-) বাড়ানোর যে কৃতিত্ব সরকার দাবি করে তা বাস্তবতার বিচারে রীতিমতো হাস্যকর। কারণ ৫০০ টাকায় একটি পরিবারের চিকিৎসা খরচ এবং ৩০০ টাকায় বাড়ি ভাড়া একেবারেই অসম্ভব। আরো উল্লেখ্য, এ ভাতা পিয়ন থেকে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত একই। একেই বলে সাম্যবাদ! আবার এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের উৎসব ভাতা মূল বেতনের ২৫% করে বছরে দুটি এবং কর্মচারীদের মূল বেতনের ৫০% করে বছরে দুটি। উৎসবের আনন্দে ১০০% মেতে থাকার কোনো সুযোগও নেই। সেই ব্রিটিশ রাজের লাটসাহেবের ৩ পা বিশিষ্ট কুকুরের ৭৫ টাকা মাসিক ভাতা আর পাঠশালার পণ্ডিতমশাইয়ের মাসিক বেতন ২৫ টাকার গড়মিল আজও গেল না। বর্তমানে প্রাথমিক হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের জন্য শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন তো দীর্ঘদিন ধরেই চলছে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ও একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের শিক্ষক সমাজের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে গণঅভ্যুত্থানে ড. সামছুজ্জোহা এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমাদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান, প্রফেসর আলী আনোয়ার ও ড. অজয় রায় এর নাম উল্লেখ না করলেই নয়। সেই শিক্ষক সমাজের আজ স্বাধীন বাংলাদেশে আরো ভাল থাকার কথা, সম্মান নিয়ে বাঁচার কথা। কিন্তু বাস্তবতা সবারই জানা। এ কথাও সত্য যে গত সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েক হাজার শিক্ষক দিয়েছে, ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ধাপে ধাপে সরকারি করেছে এবং সরকারি কলেজ পর্যায়ে কয়েক হাজার শিক্ষকের পদোন্নতির ব্যবস্থা করেছে। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে। পাশাপাশি এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কুখ্যাত অনুপাত প্রথা (৫ঃ২) প্রত্যাহার করা হয়নি। এমপিওভুক্ত ডিগ্রি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সহযোগী অধ্যাপক পদ সৃজনের নীতিমালা তৈরির কাজ ২০১০ সাল থেকেই চলছে। কবে সে নীতিমালা হবে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের তা জানা নেই। কয়েক বছর আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমপিওভুক্ত ডিগ্রি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের জন্য নীতিমালা তৈরি করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একজন কলেজ শিক্ষক সারাজীবন প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপক থাকতে পারেন না। সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানেই বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা থাকলেও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হাজারো টন ওজনের পাথরের মতো বরাবর স্থির থাকে। এর কোন গতি নেই। সারা বিশ্ব এগিয়ে চলছে। বেশির ভাগ দেশই এনালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে-হচ্ছে। আমাদের সরকারও এনালগ বাংলাদেশকে ডিজিটালে রূপান্তরের কাজ করে চলেছেন। শুধু ব্যতিক্রম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে সরকারের টনক কবে নড়বে কে জানে। শিক্ষার তথা শিক্ষকদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন কীভাবে হবে সচেতন শিক্ষক সমাজ তা জানেন না। বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্প এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বড় বড় বাজেট দেখে অনেকেই ভাবেন দেশের শিক্ষকরা তো ভালোই আছেন। ব্যাপারটি মোটেও তা নয়। এসব প্রকল্পের সাথে শিক্ষকদের জীবনের আর্থিক মান উন্নয়নের তেমন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এখনই ভাবা দরকার।

দেশের যত্রতত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক বিবেচনাতেই বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এ দায় কার? এমপিওভুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। কোন কোন বিষয়ে কখনো কখনো একজন শিক্ষার্থীও থাকে না। তবুও বেতন চলে। এভাবে চলতে পারে না। সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে কাম্য শিক্ষার্থীবিহীন প্রতিষ্ঠানকে কাম্য শিক্ষার্থীযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। এতে শিক্ষা বাজেটের ওপর চাপ কমবে এবং শিক্ষক সমাজের বেতন-ভাতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। ২০০৬ সালের ডাকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা খাতে সংশ্লিষ্ট দেশের জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দের কথা থাকলেও ২.৫ শতাংশের উপরে বাংলাদেশ ৪৬ বছরে কখনোই যেতে পারেনি। ২০১২ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে জিডিপির মাত্র ২.৪ শতাংশ ব্যয় করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে ৩.১ শতাংশ, নেপালে ৪.৬ শতাংশ, ভুটানে ৪.৮ শতাংশ, মালদ্বীপে ১০.৩ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৫.৩ শতাংশ, সেনেগালে ৫.৮ শতাংশ, তানজানিয়ায় ৬.৮ শতাংশ, ইরানে ৪.৭ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ২.৭ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। চলতি বছর শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ যা গতবারের ২.২ শতাংশেরও কম। সরকারের পক্ষ থেকে বরাবরই সীমিত সম্পদের কথা বলা হয়। তবে অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব। উন্নত বিশ্ব দূরে থাক। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ঈর্ষণীয়। আর আমরা সে দেশের ধারে কাছেও যেতে পারছি না। কবে পারবো তাও জানি না। দেশের মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সমাজের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের বেতন ভাতা ও পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষকদের মর্যাদার স্থান অগ্রগামী করা অতি আবশ্যক। ২০১০ সালের শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন ২০১৩ এর খসড়া আইন প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছিল এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ ব্যাপারে শিক্ষক সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের মতামত নেয়া হয়েছিল। শিক্ষা আইন ২০১৩ এর ব্যাপারে মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা হতাশাজনক। দেশের কয়েক লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এবং হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে প্রাপ্ত মতামত (এই লেখকসহ ২৩৪টির অধিক) মোটেও আশাপ্রদ নয়। দেশের শিক্ষক সমাজসহ বিভিন্ন শিক্ষক-সংগঠন এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা নিলে প্রণয়নকৃত শিক্ষা আইন অধিক ফলপ্রসু হতো। বর্তমানে শিক্ষা আইন ২০১৭ চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। শিক্ষকদেরও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। শিক্ষকদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা জনগণের করের টাকায় গড়া স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। এখন তারা কর্মজীবী হিসেবে জনগণের করের টাকায় মাসিক বেতন-ভাতা নিচ্ছেন। শিক্ষক সংগঠনসমূহকে ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে এসে দাবি আদায়ে নিবেদিত হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের কোন বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে সরকারের দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। আসুন, বিশ্বের সকল শিক্ষক বিশ্বের মানব সম্পদ উন্নয়নে সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি। আমাদের উত্তরসূরিদের সুন্দর আগামী গঠনে সহায়তা করি। এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

[লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ,
ঝিটকা খাজা রহমত আলী ডিগ্রি কলেজ,
মানিকগঞ্জ]